গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৩ - ৯ মে, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

সরকার যদি মুনাফাবাজ পুঁজিপতিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান দিতে পারে

সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের জন্য টাকা দেবে না কেন

২৪ এপ্রিলের বিশাল জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ২৪ এপ্রিল শহিদ মিনার ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। মঞ্চে ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মহিলা সহ হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে সভায় যোগ দেন। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন ঃ

কমরেড প্রেসিডেন্ট, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

একদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর একদিকে আমার অসুস্থতার জন্য ডাক্তারদের রেস্ট্রিকশন, আর রাজ্য নেতাদেরও বিধিনিষেধ — এই সব নিয়েই আমি এই ঐতিহাসিক দিবসে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। কতটা পারব জানি না। যতটা পারি চেষ্টা করব।

এই সময়ে রাজ্যে কয়েক কোটি মানুষ চিটফান্ডের জালিয়াতির ফলে মর্মান্তিক পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে গেছে। চিটফান্ডের চিটিং সমস্যাটা এই রাজ্যকেই শুধু নয়, গোটা দেশকে আলোড়িত করছে। কী কী ঘটেছে আপনারা জানেন। আমাদের প্রশ্ন, এই জিনিস ঘটতে পারল কী করে? বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করে ভারত। তার শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র আছে, মজুত আমলা বাহিনী আছে, ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষা করার শক্তি আছে, শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা আছে, গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সিআইডি, আইবি, সিবিআই সহ আরও দপ্তর আছে। এদের পিছনে নিয়মিত কোটি কোটি টাকা ব্যয়ও হয়। জনগণের লাইফ ও প্রপার্টির নিরাপত্তা বিধান এদেরই দায়িত্ব, ওদের ঘোষিত লক্ষ্য। এত দপ্তর থাকার পরও একজন লোক এইভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারল কী করে? এর জবাব কে দেবে? এর দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে না? এর দায়িত্ব কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে নিতে হবে না? পূর্বতন সিপিএম রাজ্য সরকারকে নিতে হবে না? তাদের চোখের সামনেই তো ঘটেছে। একজন ব্যবসায়ী বলছে, দশ হাজার টাকা নিয়ে লক্ষ টাকা বানিয়ে দেবে! এ কী ম্যাজিক, ভোজবাজি! এখন বললেই হবে যে নেতা-মন্ত্রীরা কেউ কিছু জানতেন না! প্রশ্ন তুললেই ওরা একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। পূর্বতন বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের সাথে তৃণমূল মন্ত্রীদের তরজা চলছে কে কতটা দায়ী বা কেন্দ্র কতটা দায়ী। এ হচ্ছে যাকে বলে ব্লেম গেম— অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো। আমরা মনে করি এরা সকলে দায়ী। এরা সকলেই এটা জেনেশুনেই চলতে দিয়েছে। দায়িত্ব এদের সকলকেই নিতে হবে।

শহিদ মিনার ময়দানের মঞ্চে কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড মানিক মুখার্জী

সরকার জনগণকে সতর্ক করেনি কেন

আমাদের প্রশ্ন, এই সব চিটফান্ড চালাতে কেন কেন্দ্রীয় সরকার অ্যালাও করল? গরিব মানুষ বাঁচার জন্য বাড়তি অর্থের আশায় একটু বেশি সুদ চায়। সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পে ক্রমাগত সুদ কমিয়ে সরকার ব্যবসা প্রাইভেটের হাতে তুলে দিয়ে চিট ফান্ডের নামে চিটিং ফান্ড চলতে দিল। এভাবে যে টাকা বাড়ানো যায় না, এটা যে ফাটকাবাজি, লোক ঠকানো সর্বনাশ— একথা কি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জানা ছিল না? এরা মিডিয়া ও অন্যান্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

সারদা কাণ্ডের সিবিআই তদন্ত দাবি করল কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ এপ্রিল চিটফান্ড সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন,

২-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, কয়লা ব্লক-আইপিএল-কমনওয়েলথ গেমস-মিলিটারির অস্ত্র কেনা ইত্যাদি সব কেলেঙ্কারির পরপরই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪ হাজার চিটফান্ডের অন্যতম সারদা গোষ্ঠী কর্তৃক জনসাধারণের প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতির সাম্প্রতিক ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে, এই ধরনের অপরাধ ও অপরাধীদের লালন-পালন করে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার পচন কত গভীর ও ব্যাপ্ত। এইসব চিটফান্ডগুলি গত ৩০ বছরে ভারতের নানা রাজ্যে গজিয়ে উঠেছে, এরা অতি অল্প সময়ে জমা দেওয়া টাকার অনেক গুণ বেশি ফেরত দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের সম্পূর্ণ বেআইনি কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি, কোম্পানি ল বোর্ড এবং সর্বোপরি পুলিশ, আই বি, সিবিআই ইত্যাদি বহু রকম দপ্তরের চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে এই জালিয়াতি চলছে।

তৃণমূল কংগ্রেস দলের অন্দরমহলের অন্তর্গত প্রভাবশালী সাংসদরা, বিশেষত সারদা গোষ্ঠীর মিডিয়া বিভাগের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার একজন সাংবাদিক-রাজনীতিক অভিযুক্ত হয়েছেন। সহযোগীদের তালিকায় কিছু কংগ্রেস সাংসদ এবং এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আত্মীয়ও আছেন। সিপিএম এখন নির্বাচনী স্বার্থেই তৃণমূল ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছে, কিন্তু তার দ্বারা এই সত্যকে চাপা দেওয়া

আটের পাতায় দেখুন

বহরমপুর। ২১ এপ্রিল

পুরুলিয়া। ২৯ এপ্রিল

মন্ত্রীকে ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ২৯ এপ্রিল বিধানসভায় রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে চিটফান্ড সংস্থাগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করার দাবি জানান। তাঁরা 'সারদা' সহ চিটফান্ডগুলির মালিক ও তাদের রাজনৈতিক মদতদাতাদের শাস্তি, চিটফান্ড সংস্থা ও তাদের মালিকদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন ও আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী, কমরেড মানব বেরা, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর।

একই দাবিতে ৩০ এপ্রিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক মিছিল মহাকরণ ও রাজভবনে ডেপুটেশন দেওয়ার উদ্দেশ্যে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে যায়। ঐ দিনই দলের পক্ষ থেকে বিধানসভার বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়।

গণতন্ত্রের প্রহসন চলছে, বুদ্ধিজীবীরা নীরব

একের পাতার পর

সকল উপায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জনগণকে সতর্ক করেনি কেন? কোন দল এই চিটিং ফান্ডের টাকায় চলা কাগজে কত বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে, কোন মন্ত্রী এদের পত্রিকার উদ্বোধনে গেছে, কে কার ব্যবসা-গাড়ি-অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধনে গেছে, এসব খবর বেরিয়েছে, আরও বেরোবে। এরকমভাবে চিটফান্ডের এক কর্তার কোনও ব্যবসার উদ্বোধনে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এখন বলেছেন, ওই ব্যবসা যে চিটফান্ডের টাকায় তিনি জানেন না! এটা আজ পরিষ্কার, পূর্বতন সিপিএম সরকার এদের কাজকর্ম জানত, এদের থেকে সুযোগ সুবিধাও নিত, আবার বাইরে লোকদেখানো আইনও পাশ করিয়েছে, এখন বলছে, দীর্ঘদিন কেন্দ্র সাড়া দেয়নি। তখন তো কেন্দ্রীয় সরকার সিপিএমের সমর্থনেই চলছিল, তাহলে এতবড় সর্বনাশ রুখতে তাঁরা চাপ দিলেন না কেন? পাবলিককে নিয়ে আন্দোলন করলেন না কেন? কারণ, চিট ফান্ডগুলির সাথে তাদের দোস্তি ছিল। যথার্থভাবেই সিপিএমের প্রাক্তন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীও হাটে হাঁড়ি ভেঙে বলেছেন, সিপিএম-ও ধোয়া তুলসিপাতা নয়। পালাবদলের পর অ্যান্টিসোস্যালরা যেমন দল বদল করেছে, এই চিট ফান্ডের মালিকরাও তৃণমূলের দিকে ঢলেছে। এ রাজ্যের তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রী যেমন বলছেন, একই ভাষায় ত্রিপুরার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন, তাদের অনুষ্ঠানে ডেকেছে, তাই গেছেন। কে ডেকেছে, তার চরিত্র দেখেননি। এঁরা কি পাবলিককে অবোধ শিশু বলে মনে করেন যে, নেতারা যা বলেন, মানুষ তা-ই বিশ্বাস করবে! কোনও অজানা অচেনা লোক ডাকলে, কী উদ্দেশ্যে ডাকছে, কেন আমার উপস্থিতি ব্যবহার করছে, এ সব বিচার না করে কেউ যায়! যারা ডাকছে, তারা তো একটা সংস্থা। অ্যাম্বুলেন্স তো একটা সংস্থার, উদ্বোধনে ডাকলে জানব না সেই সংস্থা কী করে। এখন তো দু' বছর হল তৃণমূলের সরকার, তার আগে ৩৪ বছর সরকারে থেকে সিপিএম নেতারা কী করছিলেন? যদিও দুই দলের মধ্যে পার্থক্য আছে। সিপিএম নেতৃত্ব অনেক ধূর্ত! চালাক! তৃণমূল নেতৃত্ব এ ব্যাপারে এখনও কাঁচা, তাই সহজেই ধরা পড়ে যায়।

আমরা মনে করি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে পথে বসাবার পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে, রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। ভারতবর্ষের কর্পোরেট সেক্টর, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লোকসান হচ্ছে বলে, এবারকার বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান পাবলিক ফান্ড থেকে দিয়েছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার উপর ঋণের বোঝা (ডেফিসিটে) নিয়ে চলছে, তাদের তো একচেটে পুঁজিপতিদেব জন্য সমপরিমাণ টাকা অনুদান দিতে আটকালো না। এতই কর্পোরেট সেক্টরের প্রতি তাদের বদান্যতা। তা হলে সেই সরকার চিট ফান্ডে আমানতকারী সর্বস্বান্ত মানুষদের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা দিতে পারে না! দেওয়া তার নৈতিক কর্তব্য নয়? বর্তমান রাজ্য সরকারও পারে। ভোটের দিকে তাকিয়ে ইমামদের ভাতা, ক্লাবের ভাতা, অমুক-তমুক পুরস্কার — কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে! সর্বস্বান্ত আমানতকারীরা তাদের টাকা পাবে না কেন? ডিফেন্স বাজেট, পুলিশ বাজেট কমিয়ে দিয়ে, মন্ত্রী, আমলা, এমএলএ, এমপি এদের বেতন-ভাতা ছাঁটাই করে তার থেকে টাকা বের করুক সরকার। নাহলে এই লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত মানুষের আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যা গেছে গেছে! সর্বস্বান্তদের প্রতি এই কি হৃদয়বৃত্তি! সর্বস্বান্ত হয়ে যে পথের ভিখারি, তাকে বলছেন ধৈর্য ধরুন, শান্তি রক্ষা করুন! এদের এই মনোবৃত্তি নিয়ে কী বলব বলুন!

অন্যদিকে সিপিএম তাক করে বসে আছে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচনে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিকে ভিত্তি করে তাদের মরা গাঙে যদি একটু জোয়ার আনা যায়। এই জিনিসই চলছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন, যে বুর্জোয়া মিডিয়া একসময় প্রচার দিয়ে তৃণমূলকে 'পশ্চিমবঙ্গের ত্রাতা' সাজিয়েছিল, সেই বুর্জোয়া শ্রেণি বুঝছে, তৃণমূলকে দিয়ে বেশিদিন চলবে না, ওদের কাছে সিপিএম অনেক বিশ্বস্ত ও দক্ষ। তাই আবার এখন সেই মিডিয়াই সিপিএমকে তুলছে। যেমন কেন্দ্রে কংগ্রেস ও বিজেপি-কে পাল্টাপাল্টি করানো হচ্ছে মাঝে মাঝে, এখানেও তারই তোড়জোড় চলছে। আর সিপিএম নেতারা 'শুদ্ধিকরণ যজ্ঞ' করে কতটা বিশুদ্ধ হয়েছেন, সে তো আপনারা ওদের নেতা-কর্মীদের কথাবার্তায়, চালচলনে, আচার-আচরণে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তারা কি কোনও অন্যায়-ত্রুটি স্বীকার করেছে? প্রকৃতই কোনও প্রশ্নে নিজেদের সংশোধন করেছে? যতদিন সরকারে ছিল, পুলিশ-প্রশাসন-ক্রিমিনাল বাহিনী আর টাকার থলি ছিল, ততদিন সিপিএম বীরদর্পে ঘুরে বেড়াত, গণআন্দোলনের উপর ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ, হামলাবাজি, সন্ত্রাস— সবকিছু করে বেড়াত। আর এখন সরকার হারিয়ে সেই বীররাই গর্তে ঢুকে আছে, আর আগামী সুদিনের জন্য অপেক্ষা করছে। সিপিএম যা যা অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার করেছে, 'পরিবর্তনে'র নাম করে এখন তৃণমূল তাই করছে।

এখানে আমি আর একটা কথা বলব। ওরা বলছে, আইন না থাকার জন্য নাকি সারদা কোম্পানির বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারেনি। খুব আইনের লোক তারা! বলছেন, কেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করছি, কেন্দ্র আইন করছে না। বছরের পর বছর চলে গেছে, যা ঘটার ঘটে গেছে। এবার আমি তাঁদের বলি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙার সময় তো আপনারা আইনের তোয়াক্কাই করেন না। কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরে প্রাইমারি পরীক্ষার অব্যবস্থা নিয়ে আমাদের ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ ছিল। আমাদের ডি এস ও-র ছেলেমেয়েদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের কী কেস দিয়েছে জানেন? নারীর শ্লীলতাহানির কেস। প্রাইমারি পরীক্ষা নিয়ে বিক্ষোভ, বিক্ষোভে পুলিশ অ্যারেস্ট করল, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নারীর শ্লীলতাহানির কেস দিল। এই হচ্ছে আইনের পূজারিদের কাজ। তৃণমূল সরকারে আসার পর আমরাই প্রথম অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা তোলার বিরুদ্ধে মিছিল করলাম। হ্যাঁ আমি বলছি, শিক্ষার দাবি নিয়ে সেই মিছিলে স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। হঠাৎ প্রচার করে দেওয়া হল, একটা স্কুলের ছাত্রদের ডি এস ও কর্মীরা কিডন্যাপ করে মিছিলে নিয়ে গেছে। সবটাই ভিত্তিহীন। তবু কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করা হল, পুলিশ গ্রেপ্তার করতে ছুটল। এক তৃণমূল নেতা হুকুম দিয়েছেন, ফলে পুলিশকে করতেই হবে। এসব সময়ে তো পুলিশ আইনের কোনও পরোয়া করে না। সিপিএমের আমলে আইন অমান্যে হয়তো পুলিশের সাথে কিছু ঠেলাঠেলি হয়েছে আমাদের, তাতেই আমাদের কত কর্মীর বিরুদ্ধে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার কেস দিয়েছে, ১৫-২০ বছর ধরে সেই মামলার জেরে গণআন্দোলনের কর্মীদের এখনও হয়রানি চলছে। এনকাউন্টারের নামে কত বিরোধীদের খুন পর্যন্ত করেছে। মালিকের হুকুমে কত নিরপরাধদের জেল-হাজতে পুরে দিচ্ছে। এদেশে পুলিশ, মালিক ও নেতাদের হুকুমে আগে অ্যারেস্ট করে, তারপর ঠিক করে কোন আইনে জব্দ করা যাবে। ওরা খুব আইনের পূজারি তো! তাই মালিক, কালোবাজারি, ঠগবাজ, ডাকাতদের ক্ষেত্রে কোনও আইন নেই, পুলিশ সেখানে যেন নিরুপায়।

বড় বড় দল, সরকার ও নেতাদের বিপুল টাকা কোথা থেকে আসে

আপনারা জানেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে বড় বড় রাজনৈতিক দল, সরকার, নেতা— এরা দাঁড়িয়ে আছে মানি পাওয়ারের উপরে। একচেটিয়া পুঁজিপতি, বড় ব্যবসায়ী, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স, স্মাগলার্স, নারী পাচারকারী, আর তার সাথে এইসব চিটফান্ড এবং এরকম আরও নানা অসাধু ব্যবসা থেকেই তাদের টাকার জোগান হয়। ভারতে একটা দল পাওয়া যাবে না, কংগ্রেস বলুন, বিজেপি বলুন, যাদের নেতারা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত নয়। আর সিপিএম! সিপিএমের ফান্ড কত জানেন! ইলেকশন কমিশনে সি পি এমের নিজের দাখিল করা হিসেবে কংগ্রেস, বিজেপি ও মায়াবতীর বি এস পি-র পরেই সিপিএমের ফান্ড। রাস্তার মুটে মজুররা দিয়েছে নাকি এই বিপুল পরিমাণ টাকা? কোথা থেকে এত টাকা আসে? ইলেকশন মানেই হচ্ছে মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার। ইলেকশন মানে মিডিয়া পাওয়ার, ইলেকশন মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার।

আজকের গণতন্ত্র আর 'বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, অফ দি পিপল' নয়। এটা হচ্ছে বাই দি মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার — সবটাই অবশ্য জনগণের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। ডেমোক্রেসির নামে পুরোপুরি জালিয়াতি চলছে। সমগ্র বিশ্বে বুর্জোয়ারা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের দেশেও তাই। বুর্জোয়া দলগুলোর মধ্যে যেন একটা কম্পিটিশন চলছে— কে কত টাকা খেতে পারে। বিজেপি কত খেয়েছে, কংগ্রেস তাকে ছাড়িয়ে যাবে। সিপিএম ৩৪ বছর ধরে যা খেয়েছে, তৃণমূলও এই কয়েক মাসে তাকে ছাড়িয়ে যাবে। আবার কিছু নেতা-নেত্রী আছেন, তাঁদের ধোপদুরস্ত সাদা সাধারণ পোশাক। এঁরা টাকা স্পর্শ করে পাপ কাজ করেন না। কিন্তু তাঁদের ডাইনে-বাঁয়ে যেসব কীর্তিমানরা আছে, তারা দশ হাতে লুটছে। কিন্তু 'সৎ' নেতা-নেত্রীরা কিছুই জানেন না, দেখেন না! আর সাধারণ মানুষ বলে, 'আর যাই হোক, উনি তো সৎ! চ্যালাচামুণ্ডারাই সব খারাপ।' আমি শুনি গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওরা ৩৪ বছর খেয়েছে, আমরা খাব না! এভাবে টাকা খাওয়াটা যেন অধিকারে দাঁড়িয়ে গেছে। যত তোলাবাজ, প্রোমোটার, ল্যান্ড মাফিয়া, কন্ট্রাকটার, ক্রিমিনাল, আর এই পুলিশ — এর উপরই আমাদের দেশের মহান বুর্জোয়া গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। একবার ভেবে দেখুন, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ, তিলক, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, সূর্য সেনরা রাজনীতির কী উচ্চ মান তুলে ধরেছিলেন। আজকের গদিসর্বস্ব ক্ষমতালোভী দলগুলি সেই রাজনীতিকে কোথায় টেনে নামিয়েছে!

এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র একদিন ইউরোপে এসেছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের ঝান্ডা উড়িয়ে। তখন ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্পের প্রাচীর ভাঙছে। বৃহৎ শিল্পের দিকে যাত্রা ঘটছে। আঞ্চলিক বাজার ভেঙে জাতীয় বাজারের সৃষ্টি হচ্ছে। তখন ভূমিদাসদের মুক্তির প্রশ্ন এসেছিল নতুন নতুন শিল্পে 'স্বাধীন' শ্রমিকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন ছিল প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য। এই ছিল পুঁজিবাদের অগ্রগতির যুগ, যা দেখে রামমোহন, বিদ্যাসাগররা মুগ্ধ হয়েছিলেন একদিন। এখান থেকেই সিভিলাইজেশন কথাটা এসেছিল। মডার্ন সিভিলাইজেশন— ইউরোপ থেকে আসা আধুনিক সভ্যতা। কিন্তু মহান মার্কস দেখালেন, ইতিহাসের নিয়মেই এ পুঁজিবাদ সংকটে পড়বে। কারণ, পুঁজিবাদে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা — লাভ। শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির থেকে বঞ্চিত না করে মালিকের এই লাভ নেই। পুঁজিবাদের প্রয়োজন বাজার। ওরা মানব সমাজ বলে না, বলে হিউম্যান মার্কেট। মূল কথাটা হচ্ছে মার্কেট। বলে, মার্কেট আছে কি? মার্কেট চাই, মানে খদ্দের চাই! পুঁজিবাদে মানুষ হচ্ছে মনুষ্যরূপী একটা কাঁচামাল। মুনাফার মেশিনে ফেলে তাকে ব্যবহার কর। নিংড়ে নাও মুনাফার জন্য। আবার, এর ফলেই খদ্দেরের অভাবে বাজার সঙ্কট দেখা দেয়।

গণতন্ত্রের প্রহসন চলছে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা নীরব

কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যুগে ইউরোপ মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু সেই পুঁজিবাদ যখন একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে, ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির মিশ্রণ ঘটিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়ে এবং শেয়ার মার্কেট, স্টক এক্সচেঞ্জ, শিল্প উৎপাদন, কৃষি উৎপাদন কন্ট্রোল করা এবং বিদেশের বাজারকে লুণ্ঠন করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে চলে গেল, তখন লেনিন দেখালেন পুঁজিবাদের বিকাশের যুগ শেষ, এখন শুরু হল ক্ষয়ের যুগ। যে গণতন্ত্রের ঝান্ডা বুর্জোয়ারা প্রগতির যুগে এনেছিল, সাম্রাজ্যবাদের যুগে আজ তারাই সেই ঝাণ্ডাকে পদদলিত করছে। নিজের দেশে জনগণের উপর শোষণ-জুলুম, অপর দেশে গিয়ে সেখানকার মানুষকেও লুণ্ঠন ও শোষণ করা — এইভাবেই বিশ্বে পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে। আজ আপনারা কি ইউরোপ থেকে শেক্সপিয়ারকে পান? শেলিকে পান? বায়রনকে পান? মিলকে পান? বার্ক- রুশো-ভল্টেয়ারকে পান? ফুয়েরবাক- কান্ট- স্পিনোজাকে পান? একদিন ইউরোপ এঁদের জন্ম দিয়েছিল। আজ ইউরোপ-আমেরিকা জন্ম দিচ্ছে বিকৃত রুচি ও মনের মানুষ, যারা স্কুলে গিয়ে নির্বিচারে শিশুদের হত্যা করছে, যারা স্কুল জীবনেই যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, যারা লিভ টুগেদার, হোমো সেক্সুয়ালিটি লিগালাইজ করার দাবি তুলছে। আমেরিকা-ইউরোপ তৈরি করছে হরেক রকমের মারণ গ্যাস ও অস্ত্র, পরীক্ষা চলছে কত দ্রুত কত বেশি মানুষকে হত্যা করার অস্ত্র বানানো যায়। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য আমেরিকা-ব্রিটেনের ভূমিকা কী? ঐ আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন তৈল লুণ্ঠন ও আধিপত্য কায়েমের জন্য ষড়যন্ত্র করে একটা মিথ্যা রটিয়ে দিল— ইরাকের বুকে মারণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে, না আটকালে ওরা বিশ্ব ধ্বংস করে দেবে। দু'দেশের পার্লামেন্ট এই মিথ্যাকেই অনুমোদন দিল, ইরাককে আক্রমণ করা হল। ওদের এই প্রচার যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা আজ বিশ্বের মানুষ জানে। অথচ সেই মিথ্যা ধুয়া তুলে ইরাককে ছাই করে কয়েক লক্ষ নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করল। বিদ্যায়তন, হাসপাতাল, মসজিদ, গ্রাম, শহর সব ধ্বংস করে দিল। আমাদের দেশ সহ কোনও দেশের পার্লামেন্ট কি এতটুকু প্রতিবাদ করল? কোথায় ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা? আজ যদি রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ থাকতেন, এ জিনিস কি সহ্য করতেন? শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র থাকলে কি সহ্য করতেন? ইরাকের পর ওরা লিবিয়াকে ধ্বংস করল, আফগানিস্তানকে ধ্বংস করল, সিরিয়াকে এখন ধ্বংস করছে। 'স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারি' এইসব বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু

তিনের পাতায় দেখুন

সরকার পাল্টাতে পারে, জীবনের সঙ্কট কাটবে না

দুয়ের পাতার পর

নীরব। তাঁদের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, মর্মবেদনা নেই। ইন্টেলেকচুয়াল শব্দের বাংলা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী। সমাজপ্রগতিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এঁরা বুদ্ধিকে ব্যবহার করেন না, বুদ্ধিকে অর্থ ও নাম অর্জনের জীবিকা হিসাবে এঁরা গ্রহণ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ যখন প্রতিবাদও করেন, তখন করেন হিসেব করে, গা বাঁচিয়ে। এ না হলে বুদ্ধিজীবী!

কিন্তু এসব বুদ্ধিজীবীদেরই দেখবেন, স্ট্যালিনকে অত্যাচারী বলতে সর্বদা উন্মুখ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জার্মানির পঞ্চম বাহিনী (গুপ্ত এজেন্ট) বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, রাশিয়ার বুকেও ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাবার জন্য স্ট্যালিন তাদের বিচার করে শাস্তি দেন। এরকম প্রকাশ্য বিচার দুনিয়াতে ইতিপূর্বে কোনও দিন হয়নি। বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের বলেছেন, তোমাদের দূত পাঠাও, আইনজীবী পাঠাও। যাঁরাই সেইসময় উপস্থিত থেকে বিচার দেখেছেন, প্রত্যেকে বলেছেন, ন্যায়বিচার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষ বোস তখন জীবিত। এঁরা কেউ সেসময় ঐ মস্কো মামলার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, বিচার নিয়ে কোনও প্রশ্নও তোলেননি, কারণ এই ট্রায়ালের যৌক্তিকতা বুঝেছিলেন। আজ যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরা ওঁদের থেকেও বড় বুদ্ধিজীবী তো! আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কে বাধিয়ে ছিল? রাশিয়া না সাম্রাজ্যবাদ? হিটলারকে কে তৈরি করেছিল? সোভিয়েত ইউনিয়ন না পুঁজিবাদ? হিরোসিমা, নাগাসাকি শহর কারা ধ্বংস করেছে — সোভিয়েট ইউনিয়ন, না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ? ভিয়েতনামে ভয়াবহ আক্রমণ কারা চালাল? এর আগে কোরিয়াতে, চীনে আক্রমণ করেছিল কারা? উত্তর একটাই। গণতন্ত্রের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কোথায় আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা? মুখ খুলুন আপনারা, যদি আপনাদের বিবেক থাকে, যদি বুদ্ধি বিক্রি করে টাকা রোজগার করতে না চান, বি অনেস্ট। আজও যা ইরাকে ঘটছে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলুন। গুয়ান্তানামো বে কারাগার! সেখানে বন্দীদের উপর যা চলছে, তাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বললেও কম বলা হবে। আমেরিকার কারাগারগুলো চালায় ব্যবসায়ীরা। সরকার সব তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। রেকর্ড সংখ্যক বন্দীর সংখ্যা আমেরিকায়। বন্দীদের দিয়ে ২৪ ঘন্টা ব্যবসায়ীরা কাজ করায়। এই হচ্ছে মুক্ত দুনিয়ার মুক্ত গণতন্ত্র!

অধঃপতিত যুবকদের সৃষ্টি করেছে কারা

আজ ভারতবর্ষে যে নারীধর্ষণ, গণধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ রোজকার ঘটনা হয়েছে, তা কি এমনি এমনি হচ্ছে ? এরা কি জন্মলগ্ন থেকে ধর্ষক? ভারতবর্ষে ৩০-৪০-৫০ বছর আগে, কি ৬০ বছর আগে এসব জিনিস কেউ দেখেছে? হ্যাঁ কিছু সেক্সুয়াল অ্যাবেরেশন ছিল, তবে সেটা খুবই ব্যতিক্রম। তখন কি কেউ শুনেছে তিন বছরের বাচ্চা মেয়েকে রেপ করে মার্ডার করা হচ্ছে? ঠাকুরমার বয়সী মহিলাকে রেপ করে মার্ডার করা হচ্ছে? এই ধর্ষকরা কারা? এই যুবকদের কে তৈরি করেছে? ব্রহ্মা? এর জন্য কি এই সমাজব্যবস্থা দায়ী নয়, দেরে শাসনভার যাদের হাতে, তারা দায়ী নয়? পুঁজিবাদ মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে, বিবেককে ধ্বংস করছে। পুঁজিবাদ জানে, এত কোটি কোটি বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক। ক্ষুধার্ত মানুষ মাথা তুলবেই যদি তার সঠিক বিপ্লবী আদর্শ ও নৈতিক মেরুদণ্ড থাকে, মানবিক বোধ থাকে, বিবেক থাকে। ফলে মদ খাও, জুয়া খেল, সাট্টা খেল, নারীর দেহ নিয়ে নোংরা চর্চা কর। নোংরা সিনেমা, ব্লু-ফ্লিম, টি ভি-র মাধ্যমে ছড়িয়ে দাও। এ দেশের মনীষীদের, বড় মানুষদের, বিপ্লবীদের নাম মুছে দাও, ছাত্র-যুবকদের সামনে আদর্শ হিসাবে আনো ফিল্ম স্টার, ক্রিকেটারদের, ন্যুড পিকচারের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দাও। মদের দোকান বাড়াতে হবে, কারণ সরকারের আয় বাড়ছে। এই যুক্তি একসময় সিপিএম করেছে, এখন তৃণমূলও করছে। এই হচ্ছে রাজনৈতিক দল ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলিই ক্রিমিনাল তৈরি করে। ওদের কোনও আদর্শও নেই, যুক্তি নেই, নৈতিকতা নেই। ওদের নেতারা চায় না, দলের কর্মীরা আদর্শের চর্চা করুক, যুক্তির চর্চা করুক, নৈতিকতার চর্চা করুক, তাহলে এ নেতৃত্ব চলবে না। প্রশ্ন করে করে কর্মীরা জর্জরিত করবে, দরকার হলে নেতাদের আসন থেকে টেনে নামাবে। তাই যুক্তিবাদী মনন মেরে দাও, চিন্তা-ভাবনা মেরে দাও, মানুষকে রোবট, মেশিন বানিয়ে দাও। এই ষড়যন্ত্র পুঁজিবাদের। এই ষড়যন্ত্র কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল সকলের। দেখবেন, ওদের দলের কর্মীরা রাস্তায় অনেকেই হুলিগানের মতো আচরণ করে। মদ খেয়ে মাতালও হয়, বন্দেমাতরমও করে। ইনকিলাব জিন্দাবাদও করে, আবার রাস্তা দিয়ে মেয়েরা গেলে টিটকারিও মারে। পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর ক্লাব করে দেওয়া হয়েছে। ভোট মানে ক্লাবে টাকা ঢালা। এভাবেই এরা সমাজে বেকার যুবকদের নিয়ে একটা মনুষ্যত্ব-বিবেকহীন বাহিনী তৈরি করেছে, যেটা জার্মানিতে এক সময়ে হিটলার করেছিল, নাৎসিরা করেছিল। তারা যুবকদের বলেছিল, সুযোগ-সুবিধা পাবে, টাকা পাবে— শুধু আমাদের জন্য ডান্ডাবাজি করতে হবে, মারামারি, খুনোখুনি করতে হবে। এখন এদেশেও তাই হচ্ছে। ভোটের সময় আমাদের হয়ে ভুয়া ভোট দেবে, বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখাবে, মারবে, প্রয়োজনে খুন করবে। এটাই ডিউটি। বিনিময়ে সারা বছর লুটেপুটে খাও, মদ খাও, রেপ কর, গুণ্ডামি কর — যা খুশি তাই কর। এভাবেই এই নেতারা ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্সকে ফাইট করছে! নিজেরা ভদ্রতার মুখোশ পরা ক্রিমিনালস, যুবকদের মুখোশহীন ক্রিমিনাল তৈরি করছে। সকলে এ কাজ না করলেও ঐ সব দলের একটা অংশ এসব করে বেড়ায়। এদের সাথে আবার থানার যোগাযোগ আছে। থানা হাত দেবে কী করে? থানার লোকেরাও মদ খাওয়া এবং রেপিংয়ে যুক্ত। আবার কোনও সৎ অফিসার যদি চেষ্টা করে উপরের কর্তারা হাত চেপে ধরে। না শুনলে প্রোমোশন আটকে যাবে, খারাপ জায়গায় ট্রান্সফার করে দেবে।

সমাজের নৈতিকতা ধ্বংসে সিপিএম প্রধান দায়ী

এ বিষয়ে সিপিএম সবার আগে। ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গের সরকারে থেকে সর্বস্তরে দলীয় কবজা কায়েম করে সিপিএম সমাজের নৈতিকতাকে যেভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে, ইতিপূর্বে অন্য কোনও দল তা পারেনি। তৃণমূল তো একটা আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল, তাদের কাছে উন্নত নৈতিকতা-সংস্কৃতি আশা করা যায় না। কিন্তু 'বামপন্থী', এমনকী 'মার্কসবাদী' নাম নিয়ে সিপিএমের যে রাজনীতি, তার মধ্যে কোনওদিনই নৈতিকতা-সংস্কৃতির স্থান ছিল না। নীতিহীন, নৈতিকতাহীন এই রাজনীতি ও দলবাজি দিয়ে ওরা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-যুব সমাজের একটা বড় অংশকে পাঁকে ডুবিয়েছে। ওরা শিখিয়েছে দলের জন্য, ভোটের জন্য তুমি যা খুশি সেটাই করতে পারো। মদ খাও, রাহাজানি কর, মেয়েদের টিটকিরি দাও, হেনস্থা কর, প্রোমোটারির জন্য গরিবকে উচ্ছেদ কর, কোনও দোষ নেই যতক্ষণ তুমি সিপিএমের ফ্ল্যাগ বহন করছ, পার্টিকে টাকা দিচ্ছ, মিটিং-মিছিলে লোক আনছ। এই সিপিএমের দলবল ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ফল যা দাঁড়াতে পারে, তাই হয়েছে। ওদের এই নৈতিকতাহীন রাজনীতি সম্পর্কে রাজ্যের ছাত্র-যুবদের আমরা ৬০-এর দশক থেকে সতর্ক করে এসেছি। তাই দেখুন সরকার বদল হতেই সিপিএমের ঐসব দাগি ক্রিমিনাল, তোলাবাজরা কত অনায়াসে তৃণমূলের পতাকা কাঁধে নিয়ে ফেলেছে। এ পথেই পশ্চিমবঙ্গের আজ এই চেহারা দাঁড়িয়েছে। সিপিএম যেখানে শেষ করে গেছে, তৃণমূল শুরু করেছে সেখান থেকে। সমাজে কিছু আপাতদৃষ্টিতে ভালোমানুষ আছেন, যাঁরা যুক্তি করেন, 'না এসব জিনিস ভালো হচ্ছে না।' তা আপনি এসবের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন! তখন বলেন, 'না, বুঝতেই তো পারছেন। দিনকাল খারাপ, সৎ কথা কেউ শোনে না। ফলে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করছি'। এ তো নিজের বিবেককে নষ্ট করা! একসময় বিদ্যাসাগর একাই গোটা হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সত্যের জন্য যারা লড়ে, তারা একাই শুরু করে, লড়ে, প্রয়োজনে জীবন দেয়। এইজন্যই তাঁরা বড়। আজ আমাদের দেশে একদল শিক্ষিত মানুষ, তথাকথিত সৎ মানুষ আছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লীবত্বের চর্চা করছেন। চাকরিটার জন্য, ট্রান্সফারের জন্য, প্রোমোশনের জন্য যে জিনিস পছন্দ করেন না, সেটাও মেনে নিচ্ছেন। এক দল তো সরাসরি তোয়াজই করছেন। টাকা পাচ্ছি, সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, চাকরিতে প্রোমোশন পাচ্ছি, ফলে কী দরকার ঝামেলায় গিয়ে! ক্বচিৎ কিছু নির্ভীক মানুষ পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষ তাদের শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে।

আমার প্রশ্ন, ৫০-৬০ বছর আগে এ দেশে কি যৌবন ছিল না, কৈশোর ছিল না? কৈশোর যৌবনে ছেলেমেয়েদের দেহের আকর্ষণ ছিল না? এটা থাকবেই। এটা মানবধর্ম, এটা প্রাণের ধর্ম। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল ভদ্রতা, শালীনতা, নম্রতা, বিবেক। বিবেক বলত, প্রবৃত্তি চাইলেই তাতে সাড়া দেওয়া যায় না। এই সমাজবিবেকটা মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে রামমোহন বিদ্যাসাগর জাগিয়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলন জাগিয়ে দিয়েছে। ভাবুন তো! সেটা ছিল পরাধীন ভারত, শৃঙ্খলিত ভারত। গ্রামে স্কুলে যেতে হলে হাঁটুর উপর কাপড় তুলতে হত বর্ষাকালে। বাঁশের বেড়ার স্কুল। ক'টাই বা স্কুল ছিল, ক'টাই বা কলেজ ছিল? অথচ সেদিন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে চতুর্দিকে কীভাবে মশাল জ্বলে উঠেছিল! কত দিকপালরা এসেছিলেন! আর স্বাধীনতার পর নেতাদের সুশাসনের কল্যাণে দেশে কী তৈরি হচ্ছে? তৈরি হচ্ছে কিছু চোর হিপোক্রিট মিথ্যাবাদী রাজনীতিক। তৈরি করা হচ্ছে ক্রিমিনাল, যারা কনট্রাক্টে মার্ডার করে, নারী পাচার করে, প্রেম করছি বলে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলে, তারপর ছবি বিক্রি করে টাকা নেয়। বাচ্চা মেয়েকে রেপ করে গলা টিপে মারে। ভারতের বর্তমান গণতন্ত্র এগুলিই তো জন্ম দিচ্ছে। এই তো দেশের অগ্রগতি! হ্যাঁ উন্নয়নও হচ্ছে! বিশ্বের ধনীশ্রেষ্ঠদের তালিকায় ভারতের ৫৫ জন একচেটিয়া পুঁজিপতির নাম উঠেছে, যারা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মালিক। এদের উন্নয়ন হচ্ছে, সম্পদ বাড়ছে। আর ১২০ কোটি লোকের ৯০ কোটি লোক অভুক্ত, অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এই তো দেশের অগ্রগতি!

গত বছর দেশে শিল্পের উৎপাদন সরকারি হিসাবেই ছিল ৪.৬, এ বছর নামতে নামতে ০.৬। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাকশন বন্ধ। মাইনিং প্রোডাকশন বন্ধ। আই টি সেক্টরে লালবাতি জ্বলছে। আমেরিকার বাজারে মন্দা, রপ্তানির সুযোগ কমেছে। দেশে কোটি কোটি ছাঁটাই চলছে, আরও বহু কোটি বেকার। আমাদের দেশে বেকারের হিসাব পাওয়া যায় না। কারণ এটা ব্রহ্মার দেশ, নেতারা ব্রহ্মার বরপুত্র। ওঁরা যা বলবেন, সেটাই সত্য। সব তথ্য বলছে, আমাদের অর্থনৈতিক অধোগতি হচ্ছে, কিন্তু ভারত সরকার তা স্বীকার করে না। এখানে খালি উন্নয়নই হচ্ছে।

আমেরিকায় সম্প্রতি যে ইলেকশন হয়ে গেল, দু'জনের কে প্রেসিডেন্ট হবে তার লড়াই হল, একমাত্র ইস্যু ছিল— বেকারদের কে চাকরি দেবে! অর্থনীতি কোথায় গেলে তবে আমেরিকার এই হাল হয়। আমেরিকার প্রায় দশ শতাংশ লোক এখন বেকার। কাল কাগজে দেখছিলাম, নিউইয়র্কে ৫০ শতাংশ লোক অর্ধভুক্ত আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। জার্মানি এবং চীনের অর্থনীতি ডুবছে। ভারতীয় নেতারা বলে বাইরে বাজার নেই। মানে রপ্তানি কম। আমদানি- রপ্তানি হিসাবে ঘাটতি সাংঘাতিক। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার একেবারে তলানিতে। তাই এই সঙ্কট। কিন্তু একবারও বলে, ১২০ কোটি লোকের দেশে কত বড় বাজার হতে পারে, অথচ সেই বাজারটা, যেটা আভ্যন্তরীণ বাজার, সেটা নেই কেন? কারণ কেনার লোক নেই। কেন কেনার লোক নেই? কিনবে কোথা থেকে? মানুষ তো রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত।

আগে গ্রামের মানুষ গ্রাম ছাড়তে চাইত না, আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। আর এখন গ্রাম থেকে লাখে লাখে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারত জুড়ে। স্বামী, স্ত্রী, সন্তানের খোঁজ নেই, বস্তিতে থাকে, ফুটপাথে থাকে। রাস্তায় জন্ম নেয়, রাস্তাতেই কুকুর-বিড়ালের মতো বাঁচে, দু'দিন বাদে মারা যায়, কেউ তার খোঁজও রাখে না। এই ভারতকে মনমোহন সিং দেখেছেন? বিজেপি নেতারা দেখেছেন? নরেন্দ্র মোদি দেখেছেন? সিপিএম নেতারা, তৃণমূল নেতারা দেখেছেন? তাঁরা তো শুধু আগামী বারের ভোটে কে কী কেরামতি দেখাবেন, কোন ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করবেন, কীভাবে ক্ষমতায় আসবেন সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত।

আমি তো বলেছি, পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার যদি পুঁজিপতিদের অনুদান হিসাবে দিয়ে থাক তবে অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা গরিব মানুষের জন্য দিক। গরিব মানুষের প্রাণের দাম নেই? লোকসান নয়, মালিকদের লাভের অঙ্ক একটু কমলেই আমাদের

চারের পাতায় দেখুন

সিপিএমের পরাজয় ও তৃণমূলের চরিত্র চেনানো আমাদের লক্ষ্য ছিল

তিনের পাতার পর

নেতাদের ঘুম হয় না। টাটা-আম্বানিদের একটু কম লাভ হলেই এই নেতারা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর কোথায় নয়াডাতে বিল্ডিং বানাতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের গরিব মানুষ মারা গেল, কে তার খবর রাখে? কোথায় খনিতে কাজ করতে গিয়ে কে মারা গেল, কে তার খোঁজ রাখে? কারণ, গরিবের জীবনের দাম কী?

সরকার পাল্টাতে পারে, জীবনের সঙ্কট কাটবে না

মানুষ হতাশ। বলছেন, সরকার পাল্টে পরিবর্তন কী এল? আমরাও বলি, কোনও পরিবর্তন আসেনি। এ কথা আজ আমরা এখন শুধু বলছি না, এ নিয়ে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই শহিদ মিনারের সভাতেই আমার নিজের আলোচনা আছে, আমি পড়ে শোনাতে পারি। গত লোকসভা ভোটের আগে, বিধানসভা ভোটের আগে আমরা বলেছিলাম, সরকার পাল্টাতে পারে, কিন্তু জীবনের সঙ্কট পাল্টাবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকছে, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক থাকছে, শোষণ চলছে, কালোবাজারি চলছে, এ অবস্থায় একটা সরকার সত্যই যদি এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, আমলাতন্ত্র-প্রশাসন-পুলিশকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, চুরি-দুর্নীতি আটকাতে চায়, গরিব মানুষকে রিলিফ দিতে চায়, তবে তার গদি নাও থাকতে পারে, রাষ্ট্র ফেলে দিতে পারে, পুঁজিপতি শ্রেণি ফেলে দিতে পারে এসব জেনেই একটা সরকার যদি দৃঢ়তার সাথে চায়, তবে কিছু আক্রমণ সে আটকাতে পারে, কমাতে পারে। আমি সেসময়ই বক্তৃতায় বলেছি, তৃণমূল এই কাজ করবে আমরা তা মনে করি না। ফলে আর পাঁচটা বুর্জোয়া দল এবং সিপিএম যেভাবে সরকার চালাচ্ছে, তৃণমূলও সেই পথেই যাবে। এই কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, সিপিএম লাঠি-গুলি দিয়ে গণআন্দোলন ধ্বংস করত, তৃণমূল যদি চায় এই আক্রমণ কিছুটা কমাতে পারবে। তারপর বলেছি 'যদি' শব্দটা খেয়াল করুন, যদি চায়। এটা জেনেও আমরা তৃণমূলকে লোকসভায় বিধানসভায় সমর্থন করেছিলাম। কেন করেছিলাম তা-ও প্রকাশ্য সভা করে বলেছি। অত্যাচারী, ফ্যাসিস্টিক সিপিএম সরকার আন্দোলন দমনের জন্য নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরে গণহত্যা এবং গণধর্ষণ করাল, যেটা এর আগে কোনও দিন আন্দোলন দমনে কংগ্রেস বিজেপিও করেনি, রায়টে ঘটেছে। এ অবস্থায় সিপিএম জিতলে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে অত্যাচার আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। ৩৪ বছর পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদ, কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ক্ষমতায় থেকে থেকে তাদের মধ্যে এসেছিল বিরাট ঔদ্ধত্য, ক্ষমতাপ্রিয়তা, ডোন্ট কেয়ার ভাব। এই জায়গাটায় আমরা ধাক্কা দিতে চেয়েছি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আগে আমরা কখনও 'সিপিএম সরকার হঠাও' এই স্লোগান তুলিনি। সিপিএমের বিরুদ্ধে আমরা রক্ত দিয়ে লড়েছি, কিন্তু সরকার হঠাবার স্লোগান আমরা এই প্রথম তুললাম।

আর একটা কথা বলি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন আমরাই গড়ে তুলেছি। একথা সাংবাদিকরা জানেন, কিন্তু মালিকরা চায় না এই খবর প্রকাশিত হোক। দু'টি আন্দোলনই আমরা শুরু করেছিলাম। ওখানকার জনগণ জানেন। কিন্তু সিপিএমের আক্রমণ রুখে একা আমরা এই আন্দোলন রক্ষা করতে পারতাম না। তৃণমূল বুর্জোয়াদের দল, সংবাদমাধ্যমের পচ্ছন্দসই দল। ওরা এলে আন্দোলনের প্রচার হবে, গোটা দেশ জানবে। যেটা আমরা একা করলে হত না। তৃণমূল আন্দোলনে আসতে চাইল ভোটের দিকে তাকিয়ে, অ্যান্টি সিপিএম সেন্টিমেন্টকে ভোটের কাজে লাগাবার জন্য। আর আমরা আন্দোলন করেছি দাবি আদায় করার জন্য, চাষি-মজুরের জমি রক্ষার জন্য। আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষকে গণআন্দোলন, রাজনীতি, লড়াইয়ের চেতনা দেওয়ার জন্য। সেই সময়ে এই আন্দোলনের স্বার্থেই তৃণমূলের সাথে আমরা যুক্ত হলাম। তাও প্রথম দিকে তৃণমূল-এস ইউ সি আই (সি) ঐক্য নয়, আমরা বলেছি পাবলিক কমিটি করো। সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি, নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, আমাদের প্রস্তাবে গড়ে উঠল।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই ভোট এল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূলকেই প্রচার দিল সংবাদমাধ্যম। আমরা ভোটের ঐক্যে গেলাম সংগ্রামী মানুষগুলির মধ্যে থেকে আন্দোলনের রাজনীতি রক্ষা করার জন্য, সিপিএমকে পরাস্ত করার জন্য । আমরা ঐক্যের শর্তও দিয়েছিলাম। তৃণমূল নেতৃত্ব তা মানতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা শর্ত দিয়েছিলাম, নির্বাচনী বক্তব্যে আপনারা মার্কসবাদ-বামপন্থাকে আক্রমণ করতে পারবেন না। এ না হলে গোটা লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারটাই সিপিএমকে সামনে রেখে বামপন্থার বিরুদ্ধে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে চলে যেত। খানিকটা হলেও আমরা আটকেছি। আমরা বলেছিলাম যে, আমরা সরকারে যাব না। এখানে মানিক মুখার্জী বসে আছেন। মানিকবাবুকে তৃণমূল নেতৃত্ব বলেছিলেন, সরকারে আসুন। মানিকবাবু বলেছিলেন, না, আমরা মন্ত্রীত্বে যাব না। এর আগে সিপিএমও আমাদের এমএলএ - এমপি-র অফার দিয়েছিল। তৃণমূলও দিয়েছে। আমরা কি গেছি? না যাইনি।

সিপিএমের পরাজয়ের পাশাপাশি তৃণমূলের চরিত্র চেনানোও আমাদের লক্ষ্য ছিল

আমরা যেমন সিপিএমের পরাজয় চেয়েছি, একই সাথে আমাদের লক্ষ্য ছিল, তৃণমূলের চরিত্রও উদঘাটিত করা। সরকারে যাওয়ার পর মানুষ তৃণমূলকে দেখুক, চিনুক। এখন যেমন দেখছে। এখন মানুষ কী বলছে? তৃণমূলও তো সিপিএমের পথেই চলছে। অর্থাৎ সিপিএম যে ঘৃণ্য পথ নিয়ে চলেছিল, তৃণমূল সেই পথেই চলছে। সিপিএমের পথটা আজও মানুষের কাছে ঘৃণ্য। সিপিএম নেতারা যা কীর্তি করেছেন, তাতে আজ তাদের আনন্দ পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আজকের এই অবস্থা তো তাদেরই অবদান। আমরা লোকসভা, বিধানসভায় সমর্থন না করলেও তৃণমূল জিততো বামপন্থা-মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কুৎসার ঝড় তুলে। ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। পশ্চিমবাংলা এতটাই অ্যান্টি সিপিএম হয়ে গিয়েছিল। যে পশ্চিমবাংলা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে ছিল বামপন্থার ঘাঁটি, গান্ধীবাদীরা যেখানে মাথা তুলতে পারেনি, পাঁচের দশকে-ছয়ের দশকে যে বাংলা বামপন্থী আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল,'৬৭ থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছিল, সেখানে দক্ষিণপন্থীরা মাথা তুলল কার অবদানে? আলিমুদ্দিনের নেতারাই তার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। যে রাজ্যে দক্ষিণপন্থীরা ব্রিটিশ পিরিয়ডে মাথা তুলতে পারেনি, যেখানে সুভাষ বসুর জায়গা ছিল, বিপ্লববাদের জায়গা ছিল, পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লবকে ভিত্তি করে যে রাজ্যের মানুষ কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হল— যেটাকে আত্মসাৎ করে আপনারা দল বাড়ালেন— সেই রাজ্যকে আপনারাই দক্ষিণপন্থীদের হাতে তুলে দিলেন। ইট ইজ ইওর ক্রেডিট। আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে বামপন্থাকে, কমিউনিজম-এর আদর্শকে রক্ষা করছি। আমরা ভোটের দিকে তাকিয়ে রাজনীতি করি না। আমরা আগামী পার্লামেন্ট ভোটে হারতে পারি, অ্যাসেম্বলি ভোটে হারতে পারি, তাতে কী? জিতবার জন্য নিশ্চয় লড়ব। মানুষকে সংগঠিত করে লড়ব। তার পরেও ভোটে হারতে পারি। এ দিয়ে আমাদের দলকে কেউ রুখতে পারবে? এ দল বাড়ছে কীসের জন্য? মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা দিকে দিকে আকর্ষণের ঢেউ তুলছে কী করে? বিপ্লবী শিক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করছে কী করে? সত্যের শক্তি কেউ আটকাতে পারে? ওই সব ভোট দেখিয়ে আমাদের কেউ ভয় দেখাতে পারবে না। আমরা চাই মানুষ, মানুষের হৃদয়, বিবেক। ওরা মানুষকে ভোটার রূপেদেখে, আমরা দেখি মানুষ রূপে — গরিব মানুষ, সৎ মানুষ, বিবেকবান মানুষ রূপে। আমাদের দলের মূল মন্ত্রই হচ্ছে মানুষকে জয় কর আদর্শ দিয়ে, সততা দিয়ে, শালীনতা দিয়ে, চরিত্র দিয়ে। এটাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা।

কম লোক হয় হোক, খাঁটি লোক চাই। আমরা তো এখন চাইলে,

পাঁচের পাতায় দেখুন

একমাত্র সোভিয়েতেই আশা ও আনন্দের স্থায়ী কারণ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

চারের পাতার পর

হাত পাতলে পাঁচশো, সাতশো, হাজার কোটি টাকা পেতে পারি। গোটা বাংলায়, ভারতের রাজ্যে রাজ্যে, জেলায়, অঞ্চলে অফিস খুলে কত যুবককে টাকার বিনিময়ে টানতে পারি। তাতে দল হয়তো বাড়বে, কিন্তু বিপ্লবী দল, যথার্থ মার্কসবাদী দল, মহান শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী দল হবে না। ওরকম দল দিয়ে শোষিত মানুষের অকল্যাণ করা হবে, কল্যাণ নয়। আমাদের কাছে বিপ্লবী আদর্শ ও নৈতিকতা সবচেয়ে বড়, যার জোরে আমরা মাথা উঁচু করে চলি, আমাদের কেউ কিনতে পারে না। আমরা প্যাঁচাপ্যাঁচির রাজনীতি, চালাকির রাজনীতি করি না। আমরা সত্য কথা, সোজা কথা সোজা ভাষায় বলি। কোনও খবরের কাগজের অফিসে আমরা ঘুরি না, কোনও টিভি চ্যানেলে ঘুরি না যে একটু প্রচার দিন। কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিজনেস হাউসের সাথে, উঁচু তলার কর্তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই। দলের কেন্দ্রীয় অফিস করছি কমরেডদের চাঁদায়, তাতে কুলায়নি— এখন পাবলিকের কাছে হাত পাতছি। এই নিয়ে আমরা দল চালাই।

আমি জনগণকেও বলব, সবই খারাপ, সবই খারাপ, কী হবে, কী হবে— এইভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কী করবেন? সমাজ তো রসাতলে যাচ্ছে! আপনি না হয় আপাতত সচ্ছল অবস্থায় আছেন, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। কিন্তু আপনার ছেলে বা নাতি যে একদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে না, একটা বাচ্চা মেয়েকে রেপ করবে না, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? ষাট বছরের বৃদ্ধাকে মার্ডার করবে না, তার গ্যারান্টি আছে? পরিবেশ যা, তাতে অধঃপতন কে আটকাবে? যে বুদ্ধিজীবীরা চব্বিশ ঘন্টা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে সভায় বক্তৃতা করেন, তাঁরা এসব ভাবেন? আগে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা কথা আমি আপনাদের বলি। যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের বেশিরভাগ কাব্যে-কবিতায়-গানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের জয়গান করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ কেন শেষ জীবনে ১৯৩৭ সালে বলছেন, 'শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্র বাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন, নিত্যকাল রবে যার স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধ কণ্ঠে ভয়ার্ত এই শৃঙ্খলিত যুগ যবে, নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে'।

বুর্জোয়া সভ্যতার সঙ্কট অস্থির করেছে রবীন্দ্রনাথকে

এ কোন রবীন্দ্রনাথ? হেমন্ত, বসন্ত, পৌষ প্রকৃতি নিয়ে ডুবে থাকা মানুষ কি? যে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ্লববাদের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, তিনি কেন শেষ জীবনে লিখলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। ... বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' যে রবীন্দ্রনাথ মূলত 'আর্ট ফর আর্টস সেক' চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই সরাসরি স্বদেশি রাজনীতিতে যুক্ত হননি, সেই তিনিই জীবনের শেষ জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট'-এ বলেছেন, 'নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেস্টনী হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র আমার সম্মুখে উদঘাটিত হয়েছিল, তা হৃদয়বিদারক।' পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি সভ্যতা সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলাম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।' যে রবীন্দ্রভক্তরা রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক গান-নাচে মত্ত, যারা পশ্চিমী পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির জয়গানে মুখরিত, তাঁরা এই রবীন্দ্রনাথকে চেনেন কি?' কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমতুল্য মানবতাবাদী মনীষী রমাঁ রলাঁ, বার্নাড শ', আইনস্টাইনের মতোই পশ্চিমের বুর্জোয়া সভ্যতা সম্পর্কে হতাশ হয়ে শেষ জীবনে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন— এটা আজকালকার রবীন্দ্রপ্রেমিকরা ভেবে দেখেছেন কি? এই রবীন্দ্রনাথ বলছেন রাশিয়া সম্পর্কে, কত গুরুত্বপূর্ণ কথা। আপনারা জানেন, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে বলেছিলেন, ফরাসি বিপ্লব যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আনতে পারেনি, রাশিয়া তা পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পৃথিবীতে এই একটি রাষ্ট্র যে প্রথম লিগ অফ নেশনস-এ ঘোষণা করেছিল, সকল মারণাস্ত্র ধ্বংস করা হোক। আর কেউ পারেনি এ কথা বলতে। বলেছেন, সোভিয়েত হচ্ছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

একমাত্র সোভিয়েতেই আশা ও আনন্দের স্থায়ী কারণ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

আপনারা অনেকেই জানেন না, রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা বললেন। এটা পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। আমার আগেও মনে হত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ঠিক এক নয়। গান্ধীজিও সৎ, কিন্তু গান্ধীজি অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। নূতন সত্য বোঝার মন তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাদের বেষ্টনীর বাইরে আসতে পারেননি এ কথা ঠিক, কিন্তু তার মধ্যেও নূতন দেখার চোখ ছিল তাঁর। ১৯৩৯ সালে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখছেন, 'যখন সামনে এতবড় দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি, তখনই বুঝতে পারি যে এই দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষার নিক্ষিপ্ত রুটির টুকরো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলাম রাশিয়ায় গিয়ে। ... নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নব যুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলাম।' বলছেন, 'মানবের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি, একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব। এই বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়ায় মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে। যেটাকে বলে লোভ। এই প্রার্থনা আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।' লক্ষ করুন, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে মৃত্যুশেল লোভকে নির্মূল করার চেষ্টা করছে। কত বড় সত্যোপলব্ধি তাঁর মতো মানুষের পক্ষে। এতদিন পর্যন্ত ধর্মীয় চিন্তা প্রচার করেছে পাপ, লোভ, ঈর্ষা চিরন্তন। এগুলি থাকবে। ধর্মের দ্বারা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বুর্জোয়া চিন্তাবিদরাও বলেছেন, এগুলি বেসিক ইনস্টিংক্ট, অপরিবর্তনীয় প্রবৃত্তি হয়ে থাকবে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মার্কসবাদই প্রথম বলেছে, এগুলি কোনওটাই শাশ্বত নয়, একদিন সমাজে ছিল না, এসেছে, আবার যাবে। একটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই মননজগৎ গড়ে ওঠে, আবার পাল্টে যায়। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, লোভের থেকে অসাম্য আসেনি, অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণিবিভক্ত সমাজই লোভের জন্ম দিয়েছে। আবার শ্রেণিশোষণ অবলুপ্তির পর মানব সমাজ থেকে লোভেরও অবসান ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী না হয়েও রাশিয়ার নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা যে ইতিহাসে প্রথম মানবসমাজ থেকে লোভের অবসানের জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে গভীর শ্রদ্ধায় ও আবেগে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। আজকের যে রবীন্দ্রপ্রেমিকরা ও বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা প্রচারে লিপ্ত, তাঁরা কি এই রবীন্দ্রনাথকে চেনেন? তাঁরা কি জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন যখন জ্বলছে, রবীন্দ্রনাথের অপারেশন হবে। পাশে প্রশান্ত মহলানবিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সোভিয়েত আর্মি কতদূর এগোচ্ছে? প্রশান্ত মহলানবিশ বললেন, ওরা পিছু হঠছে। দুঃখে রবীন্দ্রনাথ খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আবার অপারেশনের দিন যখন জানলেন সোভিয়েত রেড আর্মি জিতছে, কবি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, 'পারবে, ওরাই পারবে সভ্যতাকে রক্ষা করতে।' কত বড় ভরসা ব্যক্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে

পাঁচের পাতার পর

করে গেছেন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র সম্পর্কে, একবার ভেবে দেখুন।

এ সব বলার মানে এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে আমূল পাল্টে গিয়েছিলেন। না, তা নয়। কেন তিনি পারেননি, সে কথা নিজেই গভীর আফশোষের সাথে ব্যক্ত করেছেন 'ঐকতান' কবিতায়। বলেছেন, তিনি পাহাড়, তারকা, নদী, ঝর্ণা, প্রকৃতি এসব চিনেছেন। কিন্তু যে কৃষক, তাঁতি, জেলে অর্থাৎ শ্রমজীবীরা মানুষের সমাজকে চালাচ্ছে, তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। বলেছেন, ' সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে ... সে অন্তরময়, অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার, বাধা হয়ে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার। ... অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। ...' নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে কতটা আক্ষেপ নিয়ে বলেছেন বোঝা যায়। তাঁর এই ব্যর্থতার একটা কারণ তিনি যথার্থই ধরেছিলেন। সেটা হচ্ছে তাঁর উচ্চবিত্ত পরিবারের 'জীবনযাত্রার বেড়াগুলি'। আর একটা কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কে সত্যানুসন্ধানে গ্রহণ করতে না পারায় মানবসমাজের অপরিবর্তনীয় সত্য হিসাবে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, মানসিক ও কায়িক শ্রমের পার্থক্য চিরন্তন। এ পার্থক্য না থাকলে সভ্যতা চলতে পারে না। তাই তিনি বলছেন, 'এক দল তলায় না থাকলে আর এক দল উপরে থাকতে পারে না। ... উপরে না থাকলে নিতান্ত সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। ... সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। ... আমি শুধু ভেবেছি, যারা শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর ও মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য ও সেই কাজের যোগ্য, এদের জন্য যথাসম্ভব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুখ-সুবিধার চেষ্টা করা উচিত।'

সৎ মানবতাবাদীরা একটি জায়গায় আটকে গেছেন

আরেক জায়গায় বলছেন, 'সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভাষা। ব্যক্তির যদি সম্পত্তি না থাকে, অর্থাৎ ব্যক্তির হাতে যদি সম্পদের মালিকানা না থাকে, তা হলে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। .... ব্যক্তির সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরে তার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।' অর্থাৎ আপনারা দেখছেন, রবীন্দ্রনাথের বিচারে মানসিক ও কায়িক শ্রমের পার্থক্য হিসাবে সমাজে শ্রেণিবিভাগ আছে এবং থাকবে সভ্যতার প্রয়োজনেই এবং একদল 'শরীর ও মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য ও সেই কাজেরই যোগ্য'। আর ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভাষা হিসাবে 'ব্যক্তির হাতে সম্পদের মালিকানা থাকবে।' সেই ব্যক্তির নিজের প্রয়োজনের বাইরে বাকিটা সাধারণকে দেবে যেটা বুর্জোয়া মানবতাবাদী ফুয়েরবাক থেকে গান্ধীজি সকলেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এভাবে ভাবলেন কেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই সব বড় মানুষদের সমস্যা হচ্ছে, এঁরা সত্যানুসন্ধানে নিজের মনে হওয়া ও চিন্তাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'এঁরা বুঝতে পারেননি যে, কোনও ব্যক্তিই চিন্তা নিয়ে জন্মায় না। মেটিরিয়াল কন্ডিশন ও সমাজ-পরিবেশের সাথে মস্তিষ্কের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে চিন্তার জন্ম হয়। যে কোনও ব্যক্তি সমাজ পরিবেশ থেকে আপন অজ্ঞাতসারেই দৃষ্টিভঙ্গি পেয়ে থাকে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটা মেটিরিয়াল কণ্ডিশনে চিন্তা গড়ে ওঠে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কি না, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত কি না তা তাঁরা বিচার করেন না। এঁরা প্রকৃতি জগতের মতো সমাজও যে একটা নিয়মে নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, শ্রেণি বিভাগ ও ব্যক্তি মালিকানাহীন আদিম সমাজ থেকে যে পরবর্তীকালে কিছু নির্দিষ্ট কারণে শ্রেণি বিভাগ ও মালিকানা এসেছে বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেননি সমাজের নিয়মে এগুলিও একদিন অবলুপ্ত হবে। এই অক্ষমতার জন্য, শ্রেণি বিভাগ ও ব্যক্তি মালিকানাকে শাশ্বত গণ্য করে শেষ পর্যন্ত গরিবদের জন্য কিছু ন্যায্য বিধানও চেয়েছেন। সকল বড় সৎ মানবতাবাদীরা এখানেই আটকে গেলেন।

ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে

ফলে রবীন্দ্রনাথের শুধু জীবনযাত্রার বেড়াই নয়, দৃষ্টিভঙ্গিও অন্তরায় হিসাবে কাজ করেছে। সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু এ কথা ঠিক তিনি ব্যর্থতাজনিত যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে ছটফট করেছিলেন, নিজের ব্যর্থতা যতটা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। এখানেই তাঁরা মহত্ত্ব। যারা দুবেলা রবীন্দ্রনাথের নাম জপ করছেন, তারা কি এর থেকে কোনও শিক্ষা নিতে পারেন?

আজকাল বুর্জোয়া শ্রেণি ও সরকারি অনুগ্রহে পালিত একদল বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা চিবিয়ে চিবিয়ে অনেক কিছু বলেন। যেমন হালে শুরু করেছেন, ছাত্রদের রাজনীতি করা চলবে না, কলেজে ইলেকশন করা চলবে না। খুব জ্ঞানী মানুষরা আজকাল এসব কথা বলেন। আমি কিছু লোকের কথা বলব। তাঁরা জ্ঞানী কি জ্ঞানী নয়, আপনারাই বিচার করবেন। হেমচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। যখন তিনি ক্লাস এইটের ছাত্র, গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য। সন্ন্যাসী বললেন, এরকম পরাধীন দেশ, তুমি সন্ন্যাসী হবে কি! যাও দেশের কাজ করো। কে এই সন্ন্যাসী? বিবেকানন্দ। ক্লাস এইটের ছাত্রকে বিবেকানন্দ বলছেন, দেশের কাজ করো। বিবেকানন্দকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তখন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সুভাষ বোস। র‍্যাভেনশ কলেজে ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের শহিদ দিবসে অনুষ্ঠান করলেন। তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন স্বনামধন্য বেণীমাধব দাশ, তাঁর টিচার। আজ তাহলে সুভাষ বোসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান, বেণীমাধব দাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে জালালাবাদে যাঁরা লড়াই করেছিল, তাঁরা অধিকাংশই ১৩-১৪-১৭ বছর বয়সের। কুমিল্লার দুটি মেয়ে সুনীতি-শান্তি, ক্লাস নাইনের ছাত্রী ছিল। পিস্তল নিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সুপারকে গুলি করেছে। ব্রিটিশদের চোখে এঁরা অপরাধী ছিলেন। আজকের বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীরা এঁদের কী বলবেন? দেশবন্ধু বলেছেন, 'এডুকেশন ক্যান ওয়েট, বাট স্ট্রাগল ফর স্বরাজ ক্যান নট'। সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ এই মিথ্যা বচনের দোহাই দিয়ে অনেকে ছাত্রদের দেশের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। অধ্যয়ন ছাত্রদের কখনও তপস্যা হতে পারে না।' শরৎবাবু বলছেন, 'বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে দূরে রাখতে পারে না। তোমাদের মতো স্কুলের ছাত্রদেরও নয়।' রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ করার পর এ সত্য বুঝবে? নাকি আমাদের দেশে অন্যায় নেই, শোষণ নেই, অত্যাচার নেই, প্রতিবাদ করার কিছু নেই? ক্ষুদিরাম ভগৎ সিং কত বয়সে রাজনীতিতে এসেছেন! ইলেকশন নিয়ে মারামারি তো করছে ওরা। '৭২-এ কংগ্রেস করেছে, পরে সিপিএম করেছে, এখন তৃণমূল করছে। যারা মারামারি করছে ইলেকশনের নামে, তারাই বলছে ইলেকশন বন্ধ করে দাও। দে আর ক্রিমিনালস। ছাত্ররা আন্দোলন করুক, সুস্থ রাজনীতির চর্চা করুক ওরা চায় না। আর মারামারি হলে যদি ইলেকশন বন্ধ করতে হয়, তা হলে সকল ভোট বন্ধ কর। পঞ্চায়েত ভোটে মারামারি হয় না, অ্যাসেম্বলি, পার্লামেন্টে মারামারি হয় না? ওসব বন্ধ করে দাও। তা হলে তো এই নেতারা বেকার হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সুস্থ রাজনীতি নয়, আদর্শ ও যুক্তির লড়াই নয়, গায়ের জোরে সিপিএম ১৯৭০-৭১ সালে সব কলেজ ইউনিয়ন দখল করল। একই কাজ করল '৭২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে। এরপর ১৯৭৭ থেকে টানা ৩৪ বছর সিপিএম এটা করেছে। এখন পাল্টা তৃণমূল এসব করাচ্ছে। এর জন্য কি ছাত্ররা দায়ী? রাজনীতি দায়ী? দায়ী তো রাজনৈতিক দলগুলির ফ্যাসিস্টিক হামলা। এটার বিরুদ্ধেই তো সোচ্চার হওয়া দরকার। ছাত্রদের কেন গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হবে?

একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এটা সকলেই জানেন, কেন্দ্রের নির্দেশে সিপিএম সরকার প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে ১৮ বছর আন্দোলন চালিয়ে আমাদের দল প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছে। এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল কারা? স্কুল-কলেজের ছাত্ররাই। এই ছাত্রদের সভায় সিপিএমের প্রলোভন ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ প্রতুল গুপ্ত, ডঃ সুশীল মুখার্জী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ ঘোষরা কতবার বক্তৃতা দিয়েছেন। এমনকী সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশির পরামর্শে দশ হাজার প্রাইমারি ছাত্রের অবস্থান পর্যন্ত কলকাতায় করা হয়েছিল। ওই বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে এখনকার বুদ্ধিজীবীরা কী বলবেন? আসলে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র এটা।

গদিই বিজেপি'র একমাত্র ধর্ম

কমরেডস, আজকের সর্বগ্রাসী সংকট আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দরা দেখে যাননি। দুঃখও হয় আজকে নৈতিকতার সংকট দেখে। একটি বহুল প্রচলিত দৈনিক লিখেছে, এক নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) বরেণ্য বিশ্বপথিক, আর এক নরেন্দ্র (মোদি) বরেণ্য ভারতপথিক! ভাবুন, কার সাথে কার তুলনা হচ্ছে। এমন দুর্দশা যে একজন বুদ্ধিজীবীকেও এর বিরুদ্ধে মুখে খুলতে দেখিনি। আমরা বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করি। যদিও তাঁর দর্শনের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা মার্কসবাদী, তিনি অদ্বৈত বেদান্তবাদী। আজকের এই সভায় সুযোগ নেই, না হলে দেখাতে পারতাম কতবড় মানবদরদি, গরিব দরদির সকল শুভকামনা অদ্বৈত বেদান্তের বাণীর বেদিতলে আত্মসমর্পণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু আর এস এস এবং নরেন্দ্র মোদির দল যে সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ-চিন্তা বিরোধী সেটা দেখাতে চাই। বিবেকানন্দ বলছেন, 'তুমি যদি ভক্ত হইতে চাও, তা হলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কী করিয়াছিলেন, ঠিক কোন দিন গীতা বলিয়াছিলেন তাহা জানিবার আবশ্যক নাই।' অর্থাৎ কে কোথায় জন্ম নিয়েছে, কৃষ্ণ কোথায় জন্ম নিয়েছে এটা তোমার বিষয় নয়। আর, আর এস এস - বিজেপি নেতারা রামের জন্মস্থান খুঁজে বের করার জন্য দাঙ্গা বাধালেন। হিন্দু ধর্মের বড় মানুষ বলে পরিচিত চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কি কোনও দিন বলেছিলেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কর, রামমন্দির গড়ে তোল? এঁরা কি হিন্দু ছিলেন না? ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা তো তালিবানদের ঐতিহাসিক বামিয়ান বুদ্ধমূর্তির ধ্বংস করারই সমতুল্য। আজ বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে এদের সমর্থন করতেন, না রুখে দাঁড়াতেন? বলছেন, আমার কাছে কৃষ্ণ যা, মহম্মদও তাই। বিবেকানন্দ বলছেন, ভারতবর্ষের মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি কেন? ব্রাহ্মণ এবং জমিদারদের অত্যাচারে গরিব হিন্দুরা মুসলমান হয়েছে। বিবেকানন্দ বলছেন, 'আমার যদি একটি সন্তান থাকত, তাকে মনঃসংযোগের অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে এক পংক্তি প্রার্থনা আর মন্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোনও প্রকার ধর্মের কথা আমি শিক্ষা দিতাম না। তারপর সে বড় হয়ে নানা মত ও উপদেশ শুনতে শুনতে এমন কিছু একটা পাবে, যা তার কাছে সত্য বলে মনে হবে। সুতরাং, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একই সাথে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।' এই হচ্ছেন বিবেকানন্দ। আজ সেই বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে নরেন্দ্র মোদিদের লাঠিপেটা করতেন না? বিবেকানন্দের আর একটা উক্তি শুনলে তো চমকে উঠবেন। এই মন্দির দেবতাকে নিয়ে বাড়াবাড়িকে ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলছেন, 'ক্রোড় টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। ... এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছেন।' এবার ভাবুন, মসজিদ ভেঙে গোটা দেশ থেকে লাখ লাখ ইঁট সংগ্রহ করে বিজেপি নেতারা যে যজ্ঞ করেছিলেন তা দেখলে বিবেকানন্দ কী বলতেন? যদিও সেই বিপুল সংখ্যক ইঁট কোথায় তলিয়ে গেছে কেউ জানে না। এই নরেন্দ্র মোদির হাত দাঙ্গায় রক্তাক্ত। এই নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে নাকি খুব উন্নয়ন হচ্ছে। তারিফ করছে কারা? একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। আর গরিবরা সেখানে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। কাজ নেই, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই, এমনকী পানীয় জল পর্যন্ত নেই। কংগ্রেসেরও হাত শিখ নিধন দাঙ্গায় রক্তাক্ত। এরা ভোট ছাড়া কিছু বোঝে না। ভোটের জন্যই হিন্দুত্ব। সিপিএম নাকি বলেছে, বিজেপি হিন্দুত্ব ছাড়লে সিপিএমের সুবিধা হয়। ওদের যে সুবিধা হয়, এটা ঠিকই। কারণ, বলা তো যায় না, হাওয়া শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাবে। এখন কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়া চলছে, আবার দরকার হলে ১৯৭৭ সালের মতো সিপিএমকে আর এস এস এবং বিজেপির হাত হয়ত ধরতে হতে পারে। 'জনস্বার্থে' তাঁরা সবই পারেন। আমি বলি, কালকে যদি কেউ বিজেপিকে বলে, নরেন্দ্র মোদি মুসলমান হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন পাওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছি, তা হলে মুসলিম হতেও অসুবিধা নেই। গদি হচ্ছে ওদের আসল ধর্ম, ওখানে হিন্দু-মুসলিম বলে কিছু নেই। আর একটি জিনিস লক্ষ করুন, পুরনো দিনের ভারতীয় সনাতন হিন্দু ধর্মে চতুর্বর্ণ প্রথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছিল। এখন তো আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্র চারটাকে আট-দশ ভাগ করেছে। শূদ্রের মধ্যে কতরকম ভাগ করা যায়, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কত ভাগ করা যায় তার নানা পরিকল্পনা হচ্ছে। এমনকী মুসলিমদের মধ্যেও ভাগ করছে। সবটাই ভোট আর ভোটব্যাঙ্ক তৈরির জন্য। নতুন একটা বর্ণ ভাগ করছে, তো তার পাল্টা আরেকটা তৈরি হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও দলিতদের দুঃসহ দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এই ভণ্ড ভোটসর্বস্ব দলগুলি 'রিজার্ভেশনের' নামে এক প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের সংবিধানে প্রথম থেকেই তো দলিতদের জন্য রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আছে। তারপরও এত দীর্ঘ বছর বাদে কি বলা চলে জনজাতি গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে, তাদের মধ্যে দারিদ্র,

সাতের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদ পচে গেছে, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে আসুন

ছয়ের পাতার পর

অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, বাস্তুচ্যুত হওয়া, বেকারত্ব— এই সব জ্বালাযন্ত্রণা নেই? বরং চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্য দিকে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও সংখ্যালঘুদের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? অতি অল্প সংখ্যক সুবিধা ভোগ করছেন মাত্র। অথচ এদের নেতারা এই নিয়েই লাফালাফি করছেন এবং একবার এ দলকে, অন্য বার ঐ দলকে ভোট দিতে বলছেন। মূল সমস্যা ধরতে দেওয়া হচ্ছে না। যতক্ষণ পুঁজিবাদ থাকবে, এই নির্মম দারিদ্র, নিষ্ঠুর বঞ্চ না, অর্থগত-জাতিগত-ধর্মগত বৈষম্য থাকবে। তাই প্রয়োজন সকল শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াই, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে।

ধর্ম আজ শোষিত মানুষের কল্যাণের পথ দেখায় না

ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কেও আমার কিছু বলার আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, আমরা ধর্ম বা ধর্মপ্রচারকদের শ্রদ্ধা করি। আমরা জানি, দাসব্যবস্থার যুগে ধর্মীয় চিন্তার জন্ম এবং সমাজ প্রগতি ও সামাজিক কল্যাণের বার্তা নিয়েই ধর্ম এসেছিল। খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই-ও করেছে। মার্কস-এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষের আলোচনায় এর উল্লেখ আছে। আবার তাঁরা এটাও দেখিয়েছেন, সেই যুগের সীমাবদ্ধতার জন্যই ধর্মীয় চিন্তাগুলি শেষ পর্যন্ত শ্রেণি শোষণের পক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু দু'টি বিষয় আছে। আধুনিক যুগের কোনও সমস্যার আলোচনাই কি কোনও ধর্মগ্রন্থে আছে? মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারত্ব, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কোন দল ঠিক, কে বেঠিক, উপনিবেশবাদ, বাজার সংকট, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ইত্যাদি আধুনিক যুগের কোনও সমস্যা নিয়েই কি কোনও ধর্ম আলোকপাত করেছে? করা সম্ভব? সেই যুগের সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আছে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম যতটুকু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যের জন্য লড়তে বলেছে, কোনও ধর্মই কি আজ তা করছে? আজ যে অবর্ণনীয় দারিদ্র চলছে, ব্যাপক নারীধর্ষণ-শিশুধর্ষণ চলছে, বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে কী করতেন? তিনি কি বলতেন, এখন মঠে গিয়ে ধ্যান কর? না, তিনি নিজেই রাস্তায় নামতেন। কিন্তু আজ এত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এত বাবাদের ভিড়, কেউ কি এর প্রতিবাদ করেছে, রাস্তায় নেমেছে? বরং আর এস এস প্রধান উপদেশ দিয়েছেন, মেয়েরা ঘরেই থাকো। সীতার মতো লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম কোর না, কারণ রাবণরা থাকবেই। এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মীয় বিধান। মদ খাওয়া, নারীর প্রতি ব্যভিচার জঘন্য পাপ, মৃত্যুদণ্ডনীয় অপরাধ— ইসলাম ধর্মের বিধান। তবুও সংখ্যালঘুদের মধ্যে এ সবের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে না? মুসলিম ধর্মীয় প্রধানরা এই নিয়ে মুখ খুলছেন, লড়াইতে নামছেন? এমনকী, যে সব ধনী শিষ্যরা লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলে মন্দির-মসজিদ বানাচ্ছেন, সেই টাকা কোত্থেকে আসে? কত গরিবের রক্ত শোষণ করে আসে, তাঁরা কি খোঁজ রাখেন? কীভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সৌদি আরবকে ব্যবহার করে ইরাকের গ্রাম-শহর, মসজিদ-হাসপাতাল-শিক্ষায়তন-কৃষি-শিল্প ধ্বংস করল, কত লক্ষ লক্ষ নাগরিক যারা প্রায় সকলেই ধর্মে, ইসলামে বিশ্বাস, তাদের খুন করাল। অথচ এটা তো দেখা যায়নি, মক্কা মসজিদ থেকে এর প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। হজরত মহম্মদ বেঁচে থাকলে কি এটা ঘটতে দিতেন? তিনি কি বলতেন এখন নমাজের সময়, ঐ সব ঝামেলায় জড়িও না? না বলতেন, নমাজ থাক, দুশমনের বিরুদ্ধে তরোয়াল ধর। ইসলামের নামে তালিবানরা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তিনি কি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন না? কিন্তু আজ কোথায় ধর্মের সে শক্তি? ইতিহাসের নিয়মে সব ধর্মীয় চিন্তারই এই ট্রাজিক পরিণতি ঘটেছে। আমার এ কথার দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাসী কাউকে যদি আঘাত করে থাকি, তা হলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমরা কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সেটা মার্কসবাদী শিক্ষকরা আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন যে, সেই যুগে ধর্মীয় বড় মানুষরা যেমন তৎকালীন সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়েছেন, আমরা তাদের শিক্ষায় এবং পরবর্তীকালের নবজাগরণ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের যুগে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছি নতুন যুগের নতুন আদর্শ মার্কসবাদের পথে। আজকের ধর্মপ্রচারকরা নয়, আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ছাত্ররাই সব যুগের বড় মানুষদের সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন করছি।

এসবই পুঁজিবাদী রাজনীতির দেউলিয়া চরিত্রকে প্রকট করছে। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদ সংকটে নিমজ্জিত। আমেরিকা ডুবছে। সাত মাস ধরে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' মুভমেন্ট চলল, ইউরোপে একটানা আন্দোলনের জোয়ার, ধর্মঘটের জোয়ার চলছে। ভাগ্যিস ইউরোপে কোনও বুদ্ধিমান সাংবাদিক নেই যে লেখে, কর্মনাশা ধর্মঘট হচ্ছে। তাহলে ওর পিঠের চামড়া তুলে দিত ইউরোপে।

পুঁজিবাদ পচে গেছে, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে আসুন

লক্ষ করুন, এই সভ্যতা পচে গেছে। যেমন রাজতন্ত্র একদিন পচে গিয়ে পুঁজিবাদ এসেছিল। আজ পুঁজিবাদ পচে গেছে, ধসে গেছে। সব দিকেই পূতিগন্ধময় বিষাক্ত দগদগে ঘা দেখা যাচ্ছে। যেমন রাজতন্ত্র পচে গিয়ে পুঁজিবাদী সভ্যতা এসেছিল। আজ পুঁজিবাদ পচে গেছে, ধসে গেছে। ফলে চাই সমাজতন্ত্র। চাই মার্কসবাদ, বৈজ্ঞানিক দর্শন। এই মার্কসবাদকে ভিত্তি করেই নতুন সভ্যতা দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। যা দেখে সেই সময় রমাঁ রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বসুদের মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা মুগ্ধ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিবিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে ধ্বংস করেছে। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার আমাদের সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে। এ ছাড়া মুক্তির অন্য পথ নেই। মনে রাখবেন কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, আজকের দিনে মার্কসবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে বিরুদ্ধতা করে কোনও প্রগতিশীল আন্দোলন হতে পারে না, সমাজের অগ্রগতি ঘটতে পারে না।

আজ ভারতবর্ষের তিন-চারটি বাদ দিলে প্রতিটি রাজ্যেই এই ২৪ এপ্রিল উদযাপিত হচ্ছে, হাজারে হাজারে জনগণ যোগ দিয়েছেন। আজকের এই বিশাল সমাবেশও দেখছেন। আপনারা কি জানেন, এই দল কীভাবে শুরু হয়েছিল? স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার একজন সৈনিক মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে মাত্র ছ'জন সঙ্গীকে নিয়ে একদিন এই দল শুরু করেছিলেন। লোক নেই, অর্থ নেই, প্রচার নেই, থাকা-খাওয়ার সংস্থান নেই। শুধু ছিল কঠিন প্রত্যয়। তিনি দেখেছেন, এতবড় মহান নবজাগরণের আন্দোলন, গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম— সবটাকেই ব্যবহার করে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতা দখল করছে। কারণ এ দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। যে সিপিআই (বর্তমানে সিপিএম, সিপিআই, নকশালে বিভক্ত) ছিল সেটা কখনও যথার্থ মার্কসবাদী পথ অনুসরণ করেনি। ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকভুক্ত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি ও রাশিয়ার মেনশেভিক পার্টির মতোই এরাও শ্রমিক শ্রেণির নয়, পেটি বুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছে। এ দেশের সকল বড় মানুষের কাছ থেকে এবং অন্য দিকে মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন। মার্কসবাদী বিজ্ঞানের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি নিজের সৃজনশীল অবদান রেখেছেন, মার্কসবাদকে যুগোপযোগী, বিকশিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন। এই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের অন্যতম ছাত্র হিসাবে আজ আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখলাম। আশা করি, আপানারা ভেবে দেখবেন।

এস ইউ সি আই (সি)-কে শক্তিশালী করুন

আপনারা বারবার ঠকেছেন, আবারও ঠকবেন যদি নিজেরা রাজনীতির চর্চা না করেন। এই দলগুলি ও বুর্জোয়া শ্রেণি চায়, আপনারা রাজনীতি বিমুখ থাকুন, অজ্ঞ, মূর্খ থাকুন, তারা যেদিকে ইচ্ছে ঠেলবে। কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি, কখনও সিপিএম, কখনও তৃণমূল— এই গোলকধাঁধাঁয় আপনাদের ঘোরাবে। খবরের কাগজ, মিডিয়াকে এরাই কন্ট্রোল করে, আর সেই খবর পড়ে আপনারা লাফালাফি করেন। আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, এই কাগজে, টিভিতে আমাদের খবর থাকে না কেন? আজকের এই বিশাল সমাবেশের খবরও কি তেমন থাকবে? অথচ যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম, তৃণমূল ও কংগ্রেসের পরই আমাদের দলীয় শক্তি। আমাদের দলের মতো এত ডিসিপ্লিনড, ডেডিকেটেড কর্মীবাহিনী কার আছে? আর এখানেই ওদের ভয়। প্রচার ছাড়াই এই দল এত এগিয়েছে, ফলে বিপ্লবী হিসাবে তো এরা বিপজ্জনক। তাই আবারও বলছি, হাওয়ার পিছনে ছুটবেন না, ভিড়ের পিছনে ছুটবেন না, নিজেদের মাথা স্থির রেখে বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকেই যাচাই করে নিন। ভিড় হলেই কি কাজ হবে, যদি সঠিক আদর্শ, কর্মসূচি, চরিত্র না থাকে? ওসব দলের অনেক ভিড় দেখেছেন। যদি মনে করেন, আমরা ঠিক পথে চলছি, আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করুন, আপনাদের ঘরের সৎ সন্তানদের আমাদের হাতে তুলে দিন। আর সব সময়ই লক্ষ রাখবেন, আমরা নেতারা, আমাদের কর্মীরা কমরেড ঘোষের শিক্ষানুযায়ী চলছি কি না। ভুল করলে, বিচ্যুতি ঘটলে তীব্র সমালোচনা করবেন। এই দলকে শুধু শক্তিশালী করাই নয়, রক্ষা করাও আপনাদের দায়িত্ব।

আর আপনারা পাড়ায় পাড়ায়, কারখানায়, প্রতিষ্ঠানে, পাবলিক কমিটি গড়ে তুলুন, কোনও দলের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের সমস্যা নিয়ে ভাবুন, লড়ুন। আমরা সাহায্য করে যাব। সৎ সাহসী যুবক-যুবতীদের নিয় ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন, যারা ডাকাত, তোলাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, বৃদ্ধদের সম্মান রক্ষা করবে, মহিলাদের অত্যাচার থেকে বাঁচাবে, আবার গণআন্দোলনে পুলিশ বাহিনীর মোকাবিলা করবে।

আপনারা জানেন যে, বিপ্লবী দল হিসাবে আমরা সবসময়ই জনগণের সুসংগঠিত, সচেতন গণআন্দোলনের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ইতিপূর্বে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কংগ্রেস শাসনে আমরা একক ও যুক্তভাবে বহু শ্রেণি সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছি। পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্ট সরকারে থাকাকালীনই আমরা সরকার বিরোধী আন্দোলনও করেছি। ১৯৭৭ সালে সিপিএম সরকারে আসার পর কিছুদিন কিছু লোকের মোহ থাকায় আমরা সাথে সাথে বৃহৎ আন্দোলনে নামিনি। কিন্তু ১৯৭৯ সালের ১৫ জুন আমরাই প্রথম জনজীবনের নানা দাবিতে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ জানাই, আমাদের শত শত কর্মী রক্তাক্ত-আহত হন। আমরা প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালাই। এরপর আরও নানা দাবিতে আন্দোলন চালাতে থাকি। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ও পুলিশের আক্রমণে আমাদের দেড় শতাধিক কর্মী খুন হন, আরও শত শত কর্মী আহত হন, অসংখ্য কর্মী মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ হয়। তখন কোনও বিরোধী দলকেই আন্দোলনের রাস্তায় দেখা যায়নি। এবারও গণ-আন্দোলনের স্বার্থেই আমরা সিপিএমের পরাজয় চেয়েছি। আমরা ভোটের আগেই তৃণমূলকে জানিয়েছিলাম তারা সরকারে গেলেও আমরা জনগণের দাবিতে লড়াই চালাব। অল্প কিছুদিন আমরা অপেক্ষা করেছি পাবলিকের মোহমুক্তির জন্য। তারপর আমরাই প্রথম তৃণমূল সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললাম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল বহাল রাখা ও অন্যান্য দাবিতে। এছাড়াও রাজ্যস্তরে ও জেলায় জেলায় বিভিন্ন স্তরের জনগণের নানা দাবিতে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি। যার খবর সংবাদমাধ্যম দেয় না। একমাত্র আমাদের দলের মুখপত্র গণদাবীতে এ খবর পাবেন। আগামী দিনে চিট ফান্ড সহ আরও নানা দাবিতে আমরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলব। আশা করি আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাব। সিপিএম, তৃণমূল সহ সব দলের সৎ কর্মী-সমর্থকদের আবেদন করছি, আপনারাও জনগণের স্বার্থে এই আন্দোলনগুলিতে সামিল হোন।

বৃষ্টি নামছে, আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। সর্বশেষে আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি আবেদন আপনাদের শোনাব। ১৯৭৪ সালে তিনি বলেছেন, "মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্যই শুরুতে যারা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন, তারা কোনও দিনই সংখ্যায় বেশি থাকেন না। তারা সব সময় মুষ্টিমেয়। তারা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক। প্রতিটি দেশে সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরে এই ছাত্র-যুবকরাই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে জনগণের কাছে যান। হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, সংগঠিত করেন। জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সাহায্য করেন। এর পরই সময় আসে গণঅভ্যুত্থানের, আর তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। তার আগে আপনাদের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে— যা কঠোর, কঠিন, কষ্টকর, কিন্তু আনন্দময়। আমি বলি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের এবং মর্যাদার পথ। .... এই সংগ্রামে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে। কিন্তু আপনারা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করেই মৃত্যুকে বরণ করবেন। অবমাননা এবং গ্লানি নিয়ে কুকুর-বেড়ালের মতো রাস্তায় পচে মরবেন না। মনে রাখবেন, মানুষ মাত্রই মরণশীল, আর মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন মর্যাদার সাথেই মৃত্যুকে বরণ করুন। আর, মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবার বা মৃত্যুকে বরণ করবার এই একটাই মাত্র নিশ্চিত পথ রয়েছে। তা হল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম, তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা।" এই হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের আবেদন। এই আবেদন আপনারা বুকে নিয়ে যান।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ
সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

মালিকের দোষেই প্রাণ গেল চার শতাধিক পোশাক শ্রমিকের

বাংলাদেশে ২ মে হরতাল

রানা আহমেদ লাশের পর লাশ দেখছে, আর বিলাপ করছে 'কোথায় আমার মা', 'হে আল্লাহ, বলো, কোথায় আমার মা'? ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে চলছে প্রিয়জনদের লাশ খোঁজার পালা।

সংবাদমাধ্যমের দৌলতে গোটা বিশ্বের মানুষ জেনেছেন, ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ঢাকা শহরের সাভারের এক পোশাক কারখানার বহুতল বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত মৃত বেড়ে ৪০০-রও বেশি, নিখোঁজ সহস্রাধিক। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেরোতে পারে আরও প্রাণহীন দেহ। পরিশ্রম করে দু'পয়সা রোজগার করে যারা বাঁচতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন পরিবার প্রতিপালন করতে, তাদের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল কারখানা মালিকের দোষে।

মালিক ঐ বহুতলটি তৈরি করেছিল নির্মাণ-বিধি লঙ্ঘন করেই। সাভারের এক ইঞ্জিনিয়ার সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, শুরুতে পাঁচতলা বিল্ডিং নির্মাণের অনুমতি ছিল। কিন্তু মালিক অবৈধভাবে তার উপর আরও তিনটি তলা নির্মাণ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মানুষ বলছেন, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী ঐ ভবন ও কারখানার মালিক।

কে এই কারখানার মালিক? মোহম্মদ সোহেল রানা, যিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগের প্রভাবশালী যুব নেতা। তাঁকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের মানুষ।

সংবাদে প্রকাশ, ঘটনার দিন সকালে শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকতে চায়নি। কারণ একদিন আগেই তারা লক্ষ করেছিল বিল্ডিংয়ে একটা বড় ধরনের ফাটল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম তা প্রচারও করেছিল। কিন্তু কারখানার ম্যানেজার শ্রমিকদের বোঝায় উদ্বেগের কিছু নেই। তারপর শ্রমিকরা ঢোকে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সেই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে।

বাংলাদেশের পোশাক কারখানার অধিকাংশই এমনতরো মৃত্যুফাঁদ। প্রায় চার হাজারের মতো পোশাক কারখানা সারা দেশে ছড়িয়ে। এর একটা বিরাট অংশের মালিকানা আমেরিকা এবং ব্রিটেনের। কম বেতনে কাজ করিয়ে বেশি মুনাফা করার জন্য তারা এখানে কাজের বরাত দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার ওয়ালমার্টও। যে ওয়ালমার্টকে এ দেশে খুচরো ব্যবসায় ঢুকতে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস, বিজেপি অত্যন্ত তৎপর। তারা জোরের সাথে প্রচার করে থাকে, ওয়ালমার্টের মতো বিদেশি সংস্থাগুলি এলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে, ভালো মজুরি মিলবে। সেই ওয়ালমার্ট বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। দৈনিক ১২-১৪ ঘন্টা খাটিয়ে যে মজুরি দেওয়া হয় তাতে এই অগ্নিমূল্যের বাজারে সংসার প্রতিপালন করাই দায়।

এই অবস্থার পরিবর্তন ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ২ মে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলি। বাম নেতৃবৃন্দের দাবি, সাভারে চার শত গার্মেন্ট শ্রমিক নিহত হওয়ার জন্য দায়ী ভবন মালিক, গার্মেন্টস মালিক, ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি কর্মকর্তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তাজরিন কারখানা সহ সকল শ্রমিক হত্যার বিচার করতে হবে। এই ধর্মঘটের আরও দাবি, নিহত শ্রমিক পরিবারকে আজীবন আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ (ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা) দিতে হবে, আহতদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ (ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা) দিতে হবে। কর্মস্থলে শ্রমিক জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিত করতে কমিশন গঠন করতে হবে। শ্রম আইন ও কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত না করে কারখানা চালানো প্রতিটি মালিককে শাস্তি দিতে হবে। গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা, অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তুরস্কে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ বর্তমান বিশ্বে ভয়াবহ বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। একটা সময় সমাজতান্ত্রিক শিবির সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সামনে বাধা হিসাবে কাজ করত। কিন্তু এই শিবিরের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদ আজ আক্রমণে বল্গাহীন। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই প্রচেষ্টার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় গত ১৪-১৯ এপ্রিল তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সভা।

আয়োজক তুরস্কের পিপল্‌স পার্টি। এই সংগঠনটি তুরস্কের পুঁজিবাদী শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সভায় আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন আয়ারল্যান্ড, ফিলিপিন্‌স, ভারত, জার্মানি, প্যালেস্টাইন, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, হন্ডুরাস, লেবানন, ভেনেজুয়েলা, ইরাক, সেনেগাল, বুলগেরিয়া, গ্রিস, নেপাল প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট ও সংগ্রামী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

ভারত থেকে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী।

আলোচ্য বিষয় ছিল — (১) সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও প্রতিরোধ সংগ্রাম, (২) সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক সংকট ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, (৩) কারাগার ও পৃথকীকরণ নীতি, (৪) সাম্রাজ্যবাদের দুর্নীতিমূলক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম (৫) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুব আন্দোলন ও যুব সংগঠন গড়ে তোলা।

কমরেড মানিক মুখার্জী বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রসঙ্গে। তিনি বলেন — সাম্রাজ্যবাদ শুধু সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবেই আক্রমণ করে না, সংস্কৃতিতেও আক্রমণ করে। সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণই সবচেয়ে ভয়াবহ। এই আক্রমণ চালানো হয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এবং চুপিসারে। এ ভেতর থেকে আন্দোলনের শক্তিকে মেরে দেয়। আজ সাম্রাজ্যবাদ জনগণের মধ্যে যতসব পশ্চাদপদ ভাবনা ধারণার সঞ্চার ঘটাচ্ছে, যা সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। একই সাথে এনে দিচ্ছে বিকৃত পচাগলা সংস্কৃতি, চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদ ও সমাজবিমুখ মানসিকতা। মানুষকে করে তুলছে অমানবিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং যন্ত্রের মতো, যার সমাজ সম্পর্কে কোনও আবেগ অনুভূতি নেই। বিপ্লবীদের আবশ্যিক কাজ হল এর বিরুদ্ধে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলা যা অবশ্যই হবে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক।

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম হয় সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শকে ভিত্তি করে শ্রেণি সচেতন শ্রমিকের সংগ্রাম থেকে। এই সংস্কৃতি বিকশিত হয় বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিঃশেষিত করার পথে। বিপ্লবীদের আবশ্যিক কাজ হল জনগণকে সর্বহারা সংস্কৃতির উন্নত নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া।

আমানতকারী ও এজেন্ট বাঁচাও কমিটির বিক্ষোভ মুর্শিদাবাদে

চিটফান্ড 'সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ' এর এজেন্ট ও আমানতকারীরা যারা সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছেন, তাঁরা ২১ এপ্রিল বহরমপুরে 'সারদা আমানতকারী ও এজেন্ট বাঁচাও কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটির আহ্বানে ২৫ এপ্রিল বহরমপুরে ৬০০-রও বেশি এজেন্ট ও আমানতকারীদের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা হয়। সভায় উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য আসরাফুল হক জুয়েল বলেন, সদ্য ১৩ জনকে নিয়ে প্রস্তুতি কমিটি গড়া হয়েছে। পরবর্তীতে স্থায়ী কমিটি গড়া হবে। তিনি বলেন, 'টাকা ফেরত এবং দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চলবে।'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির দিল্লি শাখা ১৮ এপ্রিল এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সামনে আয়োজিত সভায় 'আইনস্টাইনের জীবন ও সংগ্রামের' উপর বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। সোসাইটির সদস্য রবি কুমার সভা পরিচালনা করেন। প্রধান বক্তা চঞ্চল ঘোষ মহান বিজ্ঞানীর জীবনের নানা দিক তুলে ধরে দেখান, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার অচ্ছেদ্য মেলবন্ধনে এক বিরল চরিত্রের মানুষ ছিলেন আইনস্টাইন। বিজ্ঞানের ছাত্রদের আজ এই মূল্যবোধ চর্চা করা দরকার।

সারদা কাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবি

একের পাতার পর

যাবে না যে, সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনেই এইসব চিটফান্ডগুলির জন্ম ও বাড়বাড়ন্ত ঘটেছে, এ রাজ্য ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যেও কারবার বিস্তারলাভ করেছে। তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই সারদা গোষ্ঠীর নানা প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়েছেন। যদিও তিনি এখন বলছেন, ঐসব অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের তিনি জানতেন না। উল্লেখ্য যে, এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, সারদা গোষ্ঠী কোনও বেআইনি ব্যবসায় যুক্ত নয়।

আমরা অবিলম্বে গরিব জনগণের টাকা লুণ্ঠনকারী সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করার এবং সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করার দাবি জানাচ্ছি। তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের দাগি আসামী হিসাবে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সারদা গোষ্ঠী সহ সকল চিটফান্ডের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, সেই টাকা সাধারণ আমানতকারীদের ফেরত দিতে হবে। এই ভয়াবহ অপরাধের জন্য যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই দায়ী, তাই আমানতকারীদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য বাকি টাকা ঐ দুই সরকারকেই দিতে হবে।

পাশাপাশি জনগণের প্রতি আমাদের আবেদন, সংকটজর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে জন্ম নেওয়া এইসব জালিয়াতির ফাঁদে পা দেবেন না, এদের থেকে, এদের স্বার্থরক্ষাকারী ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকুন। এ ধরনের জালিয়াতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান এবং এগুলি বন্ধে সরকারকে বাধ্য করতে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

প্রকাশিত হয়েছে
সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন
দাম ঃ দশ টাকা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in